শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১. তাওহীদের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

রসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন, তার প্রকারভেদ - ৩

আর তৃতীয় প্রকারকে তারা এমন তাওহীদ হিসাবে নাম দিয়েছে, যা চিরন্তন ও অবিনশ্বর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। এটি হলো توحيد خاصة الخاصة অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বিশেষ স্থানের অধিকারী তাদের তাওহীদ।[1]

মানুষের মধ্যে নাবী-রসূলগণই তাওহীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ছিলেন। আর রসূলগণ তাতে নাবীদের চেয়েও অধিক পূর্ণতায় পৌঁছেছিলেন। রসূলদের মধ্যে উলুল আযমগণ ছিলেন তাওহীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিপূর্ণ। তারা হলেন, নুহ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের মধ্যে আবার আল্লাহর দুই বন্ধু ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ছিল উলুল আযম অন্যান্য নাবীদের চেয়ে আরো বেশী পরিপূর্ণ। তারা ইলম, মারেফত, আমল, অবস্থা, দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে যেভাবে তাওহীদ বাস্তবায়ন করেছেন, অন্যরা সেভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

সুতরাং রসূলগণ যেভাবে তাওহীদকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছেন, তাদের চেয়ে অধিক পূর্ণরূপে অন্য কেউ বাস্তবায়ন করতে পারেনি, তারা যেভাবে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন, অন্যরা সেভাবে করতে পারেনি এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যেভাবে নিজ নিজ কাওমের লোকদের সাথে সংগ্রাম করেছেন, অন্যরা সেভাবে সংগ্রাম করতে পারেননি। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা তার নাবীকে তাওহীদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নাবীদের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন শির্কের অসারতা বর্ণনা এবং তাওহীদের বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার গোত্রীয় লোকদের সাথে যেই তর্ক-বিতর্ক করেছেন, তা উল্লেখ করার পর এবং তার বংশধরদের হতে যারা নাবী হয়েছিলেন, তাদের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

‘‘তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, অতএব তাদের পথেই তুমি চলো এবং বলো, এ কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো বিনিময় চাই না। এটি সমগ্র সৃষ্টির জন্য একটি উপদেশমালা’’ (সূরা আনআম: ৯০)।

সুতরাং রসূলকে যাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, তাদের তাওহীদের চেয়ে অধিক পূর্ণ তাওহীদ কারো নিকট থাকতে পারে না।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীদেরকে শিক্ষা দিতেন, তারা যেন সকালে ঘুম থেকে উঠে এ দু‘আটি পাঠ করে,

أَصْبَحْنَا على فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَ عَلَى كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ وعلى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيْفاً مُسْلِماً وماَ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

‘‘আমাদের সকাল হলো ইসলামের ফিতরাতের উপর, একনিষ্ঠতার বাণীর উপর, আমাদের নাবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের উপর। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’’।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন ছিল তাওহীদ। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীন বলতে তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যে আদেশ-নিষেধ, আমল ও আক্বীদাহ-বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন, তা উদ্দেশ্য।

কালিমাতুল ইখলাস বলতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উদ্দেশ্য।

ইসলামের ফিতরাত বলতে আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে তার প্রতি যে ভালোবাসা, এককভাবে তার ইবাদতের প্রতি যে আগ্রহ, তার সাথে কাউকে শরীক না করার যে স্বভাব এবং তার দাসত্ব ও বশ্যতা স্বীকার করা, অনুগত হওয়া ও তার দিকে ফিরে যাওয়ার যে স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তা উদ্দেশ্য।

এটিই হলো আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের তাওহীদ। যে ব্যক্তি এ প্রকার তাওহীদ থেকে বিমুখ হবে, সে সর্বাধিক অজ্ঞ হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِين إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

‘‘যে ব্যক্তি নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় আচ্ছন্ন করেছে সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের দ্বীন থেকে বিমুখ হতে পারে? আমি তো দুনিয়াতে তাকে নির্বাচিত করেছি, আখেরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে। তার অবস্থা এ যে, যখন তার রব তাকে বললো, মুসলিম হয়ে যাও তখনই সে বলে উঠলো, আমি সমগ্র সৃষ্টির প্রভুর জন্য মুসলিম হয়ে গেলাম’’ (সূরা আল বাকারা: ১৩১-১৩২)।

যার নিকট সুস্থ অনুভূতি এবং ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্যকারী বোধশক্তি রয়েছে, সে তাওহীদ সাব্যস্ত করতে গিয়ে কালামশাস্ত্রবিদদের যুক্তি-তর্ক, তাদের পরিভাষা এবং তাদের পদ্ধতির প্রতি কখনোই মুখাপেক্ষী হবে না। বরং কখনো কখনো কালামশাস্ত্রবিদদের যুক্তি-তর্কের প্রতি ঝুকে পড়ার কারণে এমন সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তে পারে, যাতে সে হয়রান, গোমরাহ এবং সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে।[2]

উপকারী তাওহীদ হলো তাই, যার ধারক ও বাহকের অন্তর সকল প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকে। এ পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আগমন করবে, সে হবে সফল। কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার যে তাওহীদের দাবী তারা করেছে এবং যাকে তারা তাওহীদুল খাস্সা এবং তাওহীদু খাস্সাতিল খাস্সা বলে নাম দিয়েছে, তা ‘ফানা ফিল্লাতে[3] গিয়ে শেষ হয়।

অধিকাংশ সুফীই ‘ফানা ফিল্লাহ’ এর স্তরে পৌঁছার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এটি একটি বিপদজনক পথ। ইহা মানুষকে ওয়াহদাতুল উজুদের (সর্বেশ্বরবাদ) দিকে নিয়ে যায়।

শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আনসারী আল-হেরাবী রহিমাহুল্লাহ ‘‘মানাযিলুস্ সায়িরীন’’ গ্রন্থে যা আবৃত্তি করেছেন, তার প্রতি একটু নযর দিন। তিনি বলেছেন,

مَا وَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ ....إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدُ

تَوْحِيدُ مَنْ يَنْطِقُ عَنْ نَعْتِهِ........ عَارِيَّةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ

تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ... وَنَعْتُ مَنْ يَنْعَتُهُ لَاحِدُ

১) কোনো মাখলুকই আল্লাহর প্রকৃত তাওহীদ বাস্তবায়ন করতে পারেনি। যে কেউ আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করবে, সে মূলতঃ অবিশ্বাসী নাস্তিক বলেই বিবেচিত হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

২) যারা আল্লাহর তাওহীদ এবং তার সিফাত বর্ণনা করে, তাদের তাওহীদ প্রত্যাখ্যাত হবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাকে বাতিল করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের তাওহীদের কোনো বাস্তবতা নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

৩) আল্লাহ নিজেই নিজের যে তাওহীদ বর্ণনা করেছেন, তাই হলো তার প্রকৃত তাওহীদ। তিনি ছাড়া অন্যরা তার তাওহীদের যে বর্ণনা দেয়, তা ইলহাদ তথা তাওহীদ থেকে বিচ্যুতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। (নাউযুবিল্লাহ)

ইমাম হেরাবী রহিমাহুল্লাহ যদিও ফানা বা ওয়াহদাতুল উজুদের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু এ কবিতার মধ্যে তিনি এমন সংক্ষিপ্ত কথা বলেছেন, যার কারণেই ওয়াদাতুল উজুদে বিশ্বাসী লোকেরা তাকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে। কেউ কেউ দৃঢ় শপথ করেই বলেছে যে, তিনি তাদের সাথেই রয়েছেন। তবে কথা হলো তিনি যেহেতু তাদের মতে সমর্থক ছিলেন না, তাই তিনি যদি শরীয়াত সম্মত শব্দমালা দিয়ে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেন, তাহলেই তার কথা অধিকতর সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হতো। তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে, তিনি যে অর্থ নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন, তা বাস্তবায়ন করা যদি আমাদের আবশ্যক হতো এবং শরীয়াতে মুহাম্মাদীর উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, তাহলে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সেদিকে সতর্ক করতেন, মানুষকে সেদিকে আহবান করতেন এবং তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করতেন। কেননা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করাই রাসূলের উপর আবশ্যক ছিল।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় এ কথা বলেছেন যে, এটি হলো সাধারণ লোকের তাওহীদ, এটি হলো খাস লোকদের তাওহীদ আর অমুকটি খাস লোকদের মধ্যে অধিকতর খাস লোকদের তাওহীদ অথবা তিনি এ অর্থের কাছাকাছি কোন বাক্য উচ্চারণ করেছেন? অথবা তিনি কি এ কথাগুলোর প্রতি কোন ইঙ্গিত করেছেন?

সঠিক কথা হলো আমাদের কাছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যেসব দলীল রয়েছে এবং আমাদের যে বোধশক্তি ও বিবেক রয়েছে, তা এ কথাকে বাতিল বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেদেয়।

আল্লাহ তা'আলা যে কালাম নাযিল করেছেন, তা আমাদের সামনে রয়েছে, আমাদের সামনে রাসূলের সুন্নাত সংরক্ষিত রয়েছে, রাসূলের পরে সর্বোত্তম মানুষদের কথা ও আচার-আচরণ লিখিত রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পরিচয় হাসিলকারী ইমামদের বক্তব্যসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে। যারা তাওহীদকে উপরোক্ত তিনভাবে বিভক্ত করেছে, তাদের কাছে প্রশ্ন হলো এভাবে তাওহীদকে ভাগ করা কিংবা 'ফানা' শব্দটি কুরআন-সুন্নাহ্র কোথাও কি উল্লেখ করা হয়েছে? উপরোক্ত কথাগুলো ছাহাবী কিংবা তাবেঈ অথবা অনুসরণীয় ইমামদের কারো পক্ষ হতে এসেছে কি?

বরং দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করার কারণেই এসব পরিভাষার উৎপত্তি হয়েছে। যা খারেজীদের বাড়াবাড়ির মতই। শুধু তাই নয়; খ্রিস্টানরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে যেমন বাড়াবাড়ি করেছিল, এ সুফীদের বাড়াবাড়ি সে পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার নিন্দা করেছেন এবং তা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ)

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলো না (সূরা আন নিসা :১৭১)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

‘‘হে নাবী! তুমি বলো হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে’’ (সূরা আল মায়েদা: ৭৭)। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تُشَدِّدُوا فَيُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ رَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ»

‘‘তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করো না। তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর কঠিন করে দিবেন। তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছিল। ফলে আল্লাহ তা‘আলাও তাদের উপর কঠিন কঠিন বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন। ঐ তো তাদের পরবর্তীরা এখনো গীর্জা এবং উপাসনালয়গুলোতে রয়ে গেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের উপর চাপিয়ে দেইনি’’।[4] ইমাম আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ফুটনোট

[1]. সুফীরা এভাবে তাওহীদকে ভাগ করেছে। এ শ্রেণী বিন্যাসের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা নাবী রসূলদের কেউ এমন কোনো দ্বীন নিয়ে আসেননি, যাতে সাধারণ মানুষের জন্য এক রকম তাওহীদ ছিল এবং বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য অন্য রকম তাওহীদ ছিল। সেই সাথে তাদের দ্বীনে যাহেরী বাতেনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং সকলেই একই তাওহীদের আওতাধীন ছিলেন। সুফী ও শিয়ারা ধারণা করে যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এবং সাধারণ মানুষকে এক প্রকার ইলম শিক্ষা দিয়েছেন এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে অন্যরকম ইলম শিখিয়েছেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে তার সন্তানগণ তা শিখেছেন। পরবর্তীতে তরীকতের শাইখদের কাছে তা এসে পৌঁছেছে। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল।

সুফীরা তাওহীদকে যে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছে, তাদের ধারণায় তার দ্বিতীয় প্রকারের স্বরূপ হলো, সকল বস্তুর হাকীকত তথা আসল অবস্থায় পৌঁছার মাধ্যমে উহা অর্জিত হয়। তাদের ধারণায় আসমানী কিতাবসমূহে আল্লাহ তা‘আলা যেসব দলীল-প্রমাণ নাযিল করেছেন, আসমান-যমীনের দিক-দিগমেন্থে যেসব নিদর্শন রয়েছে এবং মানুষের নিজের মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে, তার মাধ্যমে এ প্রকার তাওহীদের স্তরে পৌঁছা সম্ভব নয়। বস্তুসমূহের হাকীকত উপলব্ধি করার মাধ্যমেই কেবল তা অর্জিত হয়। তবে প্রশ্ন হলো কে এ স্তরে পৌঁছতে পারে? তাদের ধারণায় শুধু একজন শাইখ দ্বারাই এ প্রকার তাওহীদের পরিচয় হাসিল অর্জন করা সম্ভব। তার পরে সে যাকে তা দান করবে, সে কেবল তা অর্জন করতে পারবে। এটি তাদের বাতিল ধারণা। কেননা আল্লাহ তা‘আলা

সকল মানুষের উপর একই তাওহীদের তথা তাওহীদে উলুহীয়াতের জ্ঞান অর্জন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা ফরয করেছেন। তাতে মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি।

আর সুফীদের তৃতীয় প্রকার তাওহীদ হলো, এমন তাওহীদ যা সৃষ্টির পূর্ব থেকেই রয়েছে। তাদের মতে সৃষ্টিজগতের মধ্যে এমন কোনো মাখলুক নেই যার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব রয়েছে। বরং অনাদি, অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব থেকেই সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটিকে তারা তাওহীদুল খাস্সাতিল খাস্সা নাম দিলেও এটি ওয়াহদাতুল উজুদের (সর্বেশ্বরবাদ) কুফুরী ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ প্রকার তাওহীদের মধ্যেই সুফীদের সর্বোচ্চ শাইখগণ রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট এটিই হলো সর্বাধিক নিকৃষ্ট কুফুরী।

[2]. ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি শেষ জীবনে স্বীকার করেছেন, সারাজীবন তর্কশাস্ত্রের পিছনে শেষ করে মানসিকভাবে স্বস্তিবোধ করতে পারেননি। পরিশেষে তিনি কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতির দিকেই ফিরে এসেছেন। ইমাম গাযালী সম্পর্কেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। শেষ জীবনে তিনিও দর্শন, সুফীবাদ ও তর্কশাস্ত্র পরিত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের মানহাজে ফিরে এসেছেন। আরো বলা হয়েছে যে, তিনি বুকের উপর ছহীহ বুখারী নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া গাযালীর ছাত্রদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাযালী শেষ জীবনে উপনীত হয়ে সুফীবাদ ও কালামশাস্ত্র বর্জন করে ইলমে হাদীছের দিকে ফিরে এসেছিলেন। কালামশাস্ত্রের অন্যতম ভিত্তি নির্মাণকারী ফখরুদ্দীন রাযির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তিনি শেষ জীবনে কালাম শাস্ত্র থেকে তাওবা করেছেন এবং সালাফদের পথে ফিরে এসেছেন।

[3]. সুফীবাদের পরিভাষায় فناء في الله এর পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সুফীগণ এ স্তরে পৌঁছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোনো রূপ ব্যবধান দেখতে পায় না। অর্থাৎ সুফীর চোখের সামনে তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টা, -এ দু'য়ের মাঝখানে কোনো সীমারেখা পরিলক্ষিত হয় না। সে শুধু একটি অস্তিত্বকেই চোখে দেখে এবং সে নিজেও আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এক কথায় সুফী সাধক এ পর্যায়ে পৌঁছে দুই এর পরিবর্তে পৃথিবীতে শুধু একক স্রষ্টা আল্লাহর হাকীকতকেই দেখতে পায়। অর্থাৎ সবকিছুকেই সে স্রষ্টা মনে করে। এটি মূলত ওয়াহদাতুল উজুদের (সর্বেশ্বরবাদ) বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুফীদের কেউ কেউ ফানা ফিল্লাহর ব্যাখ্যায় বলেছে, তা হলো এমন স্তর, যেখানে পৌঁছে মুমিন ব্যক্তি তার নিজের নফসের অস্তিত্ব অনুভব করে না এবং মানবিক প্রয়োজনাদিও অনুভব করে না। সে শুধু তার নফসের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকেই উপস্থিত মনে করে।

ইবনে আরাবী ফানা ফিল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন, هو زوال الصفات المذمومة وثبوت الصفات المحمودة অর্থাৎ ফানা ফিল্লাহ হলো, মানবীয় গুণাবলী দূর হয়ে যাওয়া এবং স্রষ্টার প্রশংসিত গুণাবলী স্থায়ী হওয়া। এ কথার সারমর্ম হলো, ফানা ফিল্লাহ এর স্তরে পৌঁছে সুফী সাধকের মানবীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তদস্থলে স্রষ্টার গুণাবলী চলে আসে। ফলে সে পানাহার, ঘুম বা দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তুর প্রতি মোটেই প্রয়োজন অনুভব করে না; ইবনে আরাবী ফতুহাতুল মক্কীয়ায় আরো বলেন,غاية الفناء أنه لا يرى إلا الله ولايعلم إلاالله অর্থাৎ

ফানার সর্বোচ্চ স্তর হলো, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই জানে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুফীরা ফানা ফিল্লাহ এর স্তরে পৌঁছে সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না। পৃথিবীতে যা কিছু দেখে সবই আল্লাহ, যা কিছু আছে বলে জানা যায়, তার সবকিছুই আল্লাহ। এটিই হলো ওয়াহদাতুল উজুদের কুফুরী, যাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা সর্ববৃহৎ কুফুরী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুফীদের সকল মাশায়েখই ওয়াহদাতুল উজুদের প্রবক্তা। মানসুর হাল্লাজও এ কথাই বলেছে। সে বলেছে, ما في الجبة إلا الله ‘‘আমার জুব্বার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই নেই’’। (নাউযুবিল্লাহ)

[4]. যঈফ: সুনানে আবু দাউদ হা/৪৯০৪। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন, দেখুন, সিলসিলা যঈফা হ/ ৩৪৬৮।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8871

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন